হাতের লেখা

সুব্রত রায়

বরাট ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললো - কি ব্যাপার লালুদা আপনার চেলারা সব আজ কোথায়? লালুদা বললেন - তুমি ভুল করছো। আজ শনিবার। ছেলেরা রবিবার সকালে আসে। তা তুমি এ সময়ে? চেম্বার নেই? বরাট বললো - আমার চেম্বার মঙ্গলবার থেকে বন্ধ। ঘর রঙ হচ্ছে। চেম্বারের লাগোয়া আর একটা ঘর পাওয়া গেছে। সেটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে বসবার জায়গা আর একটু বাড়াবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সোমবার থেকে আবার চেম্বারে বসতে সুরু করবো।

বরাট গলা তুলে বললো - বৌদি আমি এসে গেছি। ভেতর থেকে কেয়া বৌদি বললেন - সেটা জানাবার কি প্রয়োজন আছে? শুনেছি তুমি যখন পর্ণাকে বলো খেতে দাও তখন তোমার সামনের আর পিছনের অন্তত তিন বাড়ির সবাই জানতে পারে ডাক্তারবাবু এবার খেতে বসবেন। আজ দুপুরে তুমি আমাদের সঙ্গে ডাল-ভাত খেয়ে গেলে পারো। বরাট বললো - শনিবার দুপুরে আমি ভাত খাই না। লালুদা বললেন - তাহলে কি খাও? বরাট বললো - শনিবার আমার স্পেশাল মেনু। আট দশ টুকরো মাছ ভাজা, বয়েল্ড ভেজিটেবিল, স্যালাড আর দু-পিস পাউরুটি। আর শেষে আইসক্রিম। খাওয়াটা অন্য এক দিনের জন্য তোলা থাক। আর কি বলছিলেন আমার গলার জোর? আমি তো গ্রামে বড় হয়েছি। সেখানে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে কাউকে কিছু বলতে হলে চেঁচানো ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তাই জোরে কথা বলাটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। লালুদা বললেন - তাই নাকি? তুমি গ্রামে বড় হয়েছো? বরাট বললো - গ্রাম মানে অজ পাড়াগাঁ। হাওড়া থেকে ট্রেনে সাড়ে তিন ঘণ্টা। তারপর চার মাইল হেঁটে অথবা গরুর গাড়িতে। আমরা যখন ছিলাম তখন সেখানে ইলেকট্রিক ছিল না। দিনের আলোতে যথাসম্ভব সব কাজ করে ফেলা হতো, যাতে রাতে আলোর জন্য বেশি তেল না পোড়ে। কেয়া বৌদি জানতে চাইলেন - স্কুলের পড়াশুনা করলে কোথায়? বরাট বললো - আমাদের গ্রামে হাই-স্কুল ছিল না। তিন মাইল হেঁটে স্কুলে যেতে হতো। রোজ তিন তিন ছ-মাইল স্কুলে পড়ার জন্য হাঁটতাম।

- তোমার বাবা কি করতেন?

- আমার ঠাকুরদার বাবা কবিরাজ ছিলেন। আমার ঠাকুরদাও কবিরাজি করতেন। আমার বাবা অবশ্য সে পেশা নেন নি। তবে কবিরাজি জানতেন। অসমে একটা প্রবচন আছে, যে বাড়িতে সকলে সঙ্গীত চর্চা করে সে বাড়ির হুলো বেড়ালও গান গাইতে জানে। বাবা কলকাতায় একটা মেসে থেকে হাই-স্কুলে বাংলা পড়াতেন। শনিবার রাতে বাড়ি আসতেন আর সোমবার প্রথম ট্রেনে কলকাতায় ফিরে যেতেন। স্কুলের আয়ে সংসার চালাতে বেশ কষ্ট হতো। তাই সকালে বিকেলে বেশ কয়েকটা টিউশানি করতেন। স্কুলে বাংলা পড়ালেও অঙ্ক সহ সব বিষয় পড়াতে পারতেন। ফলে টিউশানি পেতে অসুবিধা হতো না।

- তুমি অজ পাড়াগাঁ থেকে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখলে কি করে?
- আমাদের গ্রামে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল থেকে পাস করা এক ডাক্তার ছিলেন, মাধব ডাক্তার। আমি মাধব কাকা বলতাম। বাড়ির সঙ্গে দর্মা দিয়ে তৈরি চেম্বার ছিল। মাধব কাকার এক কম্পাউন্ডার ছিল, নাম হরিচরণ। তাঁকে সবাই যাদব ডাক্তার বলে ডাকতো। মাধব কাকার ফি ছিল আট আনা। আশেপাশের গ্রাম থেকে তাঁর কাছে বহু রুগী আসতো। চেম্বার শেষ করে মাধব কাকা সাইকেল করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে রুগী দেখতেন। বাড়ি গেলে ফি ছিল এক টাকা। তাও অনেকে ফি দিতে পারতো না, অনেকে ফিয়ের বদলে তাদের খেতের তরি তরকারি দিয়ে যেতো। মাধব কাকার প্রেসক্রিপশন মতো যাদব ডাক্তার রুগীদের ওষুধ দিতো। ওষুধের দাম দিতে না পারলে মাধব কাকা বিনে পয়সাতেও ওষুধ দিয়ে দিতেন। বাবা শনিবার কলকাতা থেকে আসার সময় আগের রবিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত স্টেটসম্যান খবরের কাগজ দিয়ে আসতেন মাধব কাকার জন্য। মাধব কাকার বাড়িতে কাকিমা আর এক মেয়ে পর্ণা ছিল। সে বাড়িতে মাধব কাকার কাছে পড়াশুনা করতো। বৌদি বাধা দিয়ে বললেন - পর্ণা, মানে তোমার বউ। বাল্য প্রেম তাহলে? বরাট সলজ্জ হাসি হেসে বললো - ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। পুরোটা শুনুন। সন্ধ্যাবেলায় আমি অনেকটা সময় মাধব কাকার সঙ্গে কাটাতাম। মাধব কাকা দেশ বিদেশের নানা গল্প বলতেন আর আকাশের তারা চেনাতেন। বলতে গেলে ডাক্তার হবার ইচ্ছেটা মাধব কাকাকে দেখেই হয়েছিল। স্কুলের পরীক্ষার পর যখন কলকাতায় পড়ার কথা হলো তখন বাবা বললেন, দু-জায়গায় বাড়ি রেখে পড়ার খরচ চালানো সম্ভব নয়। আমরা গ্রামের পাট চুকিয়ে দমদমে একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকা শুরু করলাম। আমি তখন মেডিক্যালে থার্ড ইয়ারে পড়ি। একদিন দুপুর বেলায় মাধব কাকা রুগী দেখে ফেরার পথে হঠাৎ সাইকেল থেকে পড়ে গেলেন। সেরিব্রাল। যে মাধব কাকা সকলের বিপদে আপদে এত করেছেন, তিনি বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন। খবর পেয়ে বাবা দৌড়ে গেলেন। কাকিমা বাবাকে বললেন, দাদা আমাদের কি হবে? উনি তো কিছুই রেখে যান নি। বাবা বললেন, বৌমা আমাদের যদি মুখে দুটো ভাত জোটে তোমাদেরও জুটবে। তোমরা কলকাতায় চলো। আমাদের বাড়ির কাছে একটা বাড়ি ভাড়া করা যাবে। বাকি দায়িত্ব আমার। বাবা পর্ণাকে ক্লাস নাইনে ভর্তি করে দিলেন। বৌদি মন্তব্য করলেন - তা হলে তোমার বাবার উপর বেশ চাপ পড়লো বলো। দুটো সংসার চালানো তো সহজ নয়। বরাট বললো - পর্ণা দু-তিনটে ছোট বাচ্চা পড়ানো শুরু করলো। কাকিমা ভালো সেলাই জানতেন। তিনিও সামান্য রোজগার করতে শুরু করলেন। আমি পাস করলাম। ইন্টার্নশিপ শেষ করার পর রেলে চাকরি পেয়ে গেলাম। প্রথম পোস্টিং জামালপুরের রেলের হাসপাতাল। ইতিমধ্যে পর্ণা বিএ পাস করে একটা প্রাইমারি স্কুলে চাকরি পেয়েছে। কাকিমার শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না কিছুদিন ধরে। একদিন অজ্ঞান হয়ে গেলেন। সে জ্ঞান আর ফিরলো না। মেডিক্যাল কলেজে আমার স্যাররা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কিছুই করা গেল না। সব কিছু মিটে যাওয়ার পর আমি জামালপুর ফিরে গেলাম। মাস খানেক পর বাবার চিঠি পেলাম কলকাতা আসার জন্য। কলকাতায় এলাম। বাবা বললেন, একটা সমস্যা হয়েছে। পর্ণা আমার মেয়ের মতন হলেও আমার মেয়ে নয়। ওর পক্ষে

একা ভাড়া বাড়িতে থাকাটা খুব নিরাপদ নয়। আবার আমাদের এখানে নিয়ে আসাটা ভালো দেখায় না। তোমার মা রোজ রাত্তিরে ওর সঙ্গে শুতে যাচ্ছেন এতে বেশ অসুবিধা হচ্ছে। এ সমস্যার সহজ সমাধান হয় যদি তুমি পর্ণাকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাও। আমি একদিন ভেবে রাজি হয়ে গেলাম। বিয়ে হয়ে গেল। একেবারে শরৎবাবুর লেখা বিপ্রদাস উপন্যাসের দ্বিজদাস-বন্দনার বিয়ের স্টাইলে, 'এ বিবাহে নহবত বাজিল না, বরযাত্রী-কন্যাযাত্রীর বিবাদ বাধিল না, মেয়েরা উলু দিল অস্ফুটে, শাঁখ বাজিল চাপা সুরে'। বৌদি বললেন - থামলে কেন? তার পরের লাইনটা? বাসর গৃহ রহিল স্তব্ধ, মৌন। বাসর গৃহ কি স্তব্ধ, মৌন ছিল না? লালুদা বললেন, তোমার কাছ থেকে মাধব ডাক্তারের কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল এই মেডিক্যাল স্কুলগুলি তুলে দেওয়াটা ঠিক হয় নি। গ্রামে এই রকম মাধব ডাক্তারদের খুবই প্রয়োজন। এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পাশাপাশি পলিটেকনিক থেকে বছরে কত ছেলেমেয়ে বেরোচ্ছে। মেডিক্যাল কলেজের পাশে মেডিক্যাল স্কুল থাকলে কিসের আপত্তি আমি বুঝতে পারি না। বরাট বললো - কারণটা খুব সোজা। গ্রামে মোটামুটি ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকলে শহরে ভিড় কমবে, শহরের ডাক্তারদের রোজগার কমে যাবে।

লালুদা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। বললেন - শহরে কি সু-চিকিৎসা সবসময় পাওয়া যায়? আমাদের স্কুলের পণ্ডিতমশাই-এর কাছ থেকে একটা শ্লোক শুনেছিলাম। সেটা শুনলে তুমি হয়তো রেগে যাবে। পণ্ডিতমশাই-এর একমাত্র ছেলে পঁচিশ বছর বয়সে চিকিৎসা বিভ্রাটে কলকাতায় মারা যায়। পণ্ডিতমশাই তাঁর শেষ সম্বল দিয়ে ছেলের চিকিৎসা করেছিলেন। ওঁর বাড়িতে কয়েকটা পূর্বপুরুষের লেখা পুঁথি ছিল। সেগুলি পর্যন্ত এক জার্মান সাহেবকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন -

বৈদ্যরাজ নমস্তুভ্যম্
ত্বং যমরাজ - সহোদরঃ
যমঃ সংহরতি প্রাণান্
ত্বঞ্চ প্রাণান্ ধনানি চ।।

অর্থাৎ, হে বৈদ্যরাজ তোমাকে নমস্কার তুমি যমরাজের সহোদর। যম প্রাণ হরণ করেন তুমি প্রাণ এবং ধন দুটোই হরণ করো।

বরাট বললো - রাগ করার কারণ নেই। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। আমার কাছে অনেকে আসেন যারা অন্য ডাক্তারের নির্দেশে গাদা গাদা টেস্ট করাতে বাধ্য হয়েছেন। যার কোনো দরকার ছিল না। বেশিরভাগ ডাক্তারই টেস্ট পিছু কমিশন পেয়ে থাকেন। তাই দরকার না থাকলেও টেস্ট করাতে বলে থাকেন।

লালুদা বললেন - আমার যেদিন এ্যাটাক হয় সেদিন তুমি এসে না পড়লে সেদিনই পটল তুলতাম। এতদিনে যমরাজের সঙ্গে বসে হয়তো দাবা খেলতাম। বরাট জানতে চাইলো - আচ্ছা ছেলেবেলা থেকে পটল তোলা কথাটা শুনে আসছি। আলু তোলা নয়, বেগুন তোলা নয়, কুমড়ো তোলা নয় কিন্তু পটল তোলা কেন? কারণটা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। লালুদা বৌদির দিকে তাকিয়ে বললেন - তুমি কারণটা জানো? বৌদি মাথা নাড়লেন। শোনো তাহলে - লালুদা বললেন। মানুষের চোখকে পটলের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। পটল চেরা চোখ বলতে শুনেছো নিশ্চয়ই। মরে গেলে চোখের মণিটা উপর দিকে উঠে যায়। তাই মানুষ পটল তোলে, আলু-বেগুন-কুমড়ো তোলে না। বরাট বললো - আমি এতো বছর ডাক্তারি করছি, কিন্তু এটা আমার মাথায় আসে নি। আচ্ছা শুনেছি তুমি গেঞ্জি আর হাফ প্যান্ট পরে আমাকে পিজিতে নিয়ে গিয়েছিলে - লালুদা জানতে চাইলেন। বরাট বললো - চেম্বার সেরে বাড়ি এসে খেতে বসেছি। বাবলুর মুখে শুনেই বুঝতে পারলাম আপনার একটা এ্যাটাক হয়েছে। দেরি করলে বিপদ ঘটতে পারে, তাই ব্যাগটা নিয়ে বাবলুর স্কুটারের পিছনে চেপে চলে এলাম। তারপর আর এক বিপত্তি। পাড়ার ক্লাবের এমপি ফান্ডের টাকায় কেনা অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার বললো, এইমাত্র সে ফিরেছে। বড্ড ক্লান্ত। এক ঘণ্টা বিশ্রাম না করে যেতে পারবে না। আমি ছ-জন ছেলেকে ক্লাবে পাঠালাম। ওদের মধ্যে অসিত স্টেট বাস চালায়। ক্লাবে সেক্রেটারিকে ফোন করে বললাম, তোমার ড্রাইভার অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আসতে চাইছে না। আমি ছেলেদের পাঠিয়েছি। ওরা অ্যাম্বুলেন্সটা চালিয়ে নিয়ে আসবে। আর তোমার ড্রাইভারকে ক্লাবের সামনে ল্যাম্পপোস্টে আচ্ছা করে বেঁধে রাখবে। আজ রাতটা ঐ ভাবে থাকবে। লালুদা বললেন - তোমার সব কাজের মধ্যে একটা আসুরিক কম্পোনেন্ট থাকে। বরাট বললো - সব সময় বাবা বাছা বললে কাজ হয় না। রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, কামড়াবি না মাঝে মাঝে ফোঁস ফোঁস করবি। আর শরৎবাবু তো রামের সুমতিতে গল্পে এই প্রেসক্রিপশনই দিয়ে গেছেন।

*　　*　　*　　*　　*　　*　　*

স্যার আমি বরাট বলছি। আমাদের পাড়ার লালুদাকে নিয়ে পিজিতে এসেছি। লালুদার হার্ট এ্যাটাক হয়েছে। লালুদার সঙ্গে আপনি একসময় খেলেছেন। আধ ঘণ্টা হয়ে গেল। ফেলে রেখে দিয়েছে। কেউ কিছু করছে না। প্রফেসর মুখার্জি বললেন - ভালো সময় ফোন করেছ। আমি ক্যালকাটা ক্লাবে ডিনার করে সবে গাড়িটা রাস্তায় বের করেছি। এখুনি আসছি।

প্রফেসর মুখার্জিকে অসময়ে এমারজেন্সিতে ঢুকতে দেখে জুনিয়ার ডাক্তাররা তটস্থ হয়ে পড়লো। এসো আমার সঙ্গে - প্রফেসর মুখার্জি বরাটকে বললেন। পরীক্ষা করতে করতে লালুদাকে বললেন - লালু তোমার মনে আছে ইডেনে সিএবি লিগের সেই প্লে-অফ ম্যাচটার কথা। আমাকে নিরানব্বই রানে বোল্ড করে দিয়েছিলে। সে রাগটা আমি এখনও পুষে রেখেছি। তুমি এবার আমার হাতে পড়েছো, এখন আমার শোধ নেবার পালা। বরাটের দিকে তাকিয়ে

বললেন - দেখো একবার। বরাট মুখ বার করে একটা ছেলেকে বললো - আমার ব্যাগটা বাবলুর কাছ থেকে নিয়ে আয় তো। স্টেথো কানে লাগাতে এক জুনিয়ার ডাক্তার আর একজনকে বললো - ইনি ডাক্তার নাকি? আমি ভেবেছিলাম বাড়ির দারোয়ান। কথাটা প্রফেসর মুখার্জির কানে গেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রফেসর মুখার্জি বললেন - শোনো হে। তোমরা এম-বি-বি-এস পরীক্ষায় দু-তিন জন মিলে যা নম্বর পেয়েছো, বরাট একা তাই পেয়েছে। যতদূর জানি আমার পেপারে পাওয়া নম্বরের রেকর্ড এই পঁচিশ বছরে কেউ ভাঙতে পারে নি। বরাটের কমিটমেন্ট দেখো। চেম্বার থেকে ফিরে বাড়িতে খেতে বসেছে। গুরুত্ব বুঝতে পেরে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় লালুর বাড়িতে দৌড়ে এসেছে।

স্যার আমার দেখা হয়ে গেছে, বরাট বললো। কি মনে হয় তোমার - প্রফেসর মুখার্জি বললেন। বরাট বললো - একটা ভালো রকম এ্যাটাক হয়ে গেছে। আটচল্লিশ ঘণ্টা না কাটলে কিছু বলা যাবে না। এর মধ্যে আর একটা এ্যাটাক হতে পারে। দু-দিন আই-সি-ইউতে রাখলে ভালো হয়। চোখে চোখে থাকবে। ঠিক আছে - প্রফেসর মুখার্জি বললেন।

* * * * * * *

বরাট তুমি বাড়ি ফিরবে কেমন করে - প্রফেসর মুখার্জি জিজ্ঞাসা করলেন। বরাট বললো - একটা ট্যাক্সি ধরে নেবো অথবা কারুর স্কুটারের পিছনে চেপে চলে যাব। তাহলে এক কাজ করো, আমার গাড়িতে উঠো। আমি তোমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আসি - প্রফেসর মুখার্জি বললেন। বরাট বললো - আমার বাড়ি আপনার বাড়ির উল্টোদিকে। অনেক রাত হয়ে গেছে। ম্যাডাম বসে আছেন। আপনাকে পৌঁছতে যেতে হবে না। আমি নিজেই চলে যেতে পারবো। প্রফেসর মুখার্জি বললেন - ম্যাডাম তীর্থ করতে তাঁর দাদা বৌদির সঙ্গে বেনারস গেছেন। চলো গল্প করতে করতে যাওয়া যাক। বরাট গাড়িতে উঠলো। প্রফেসর মুখার্জি বললেন - কয়েকদিন আগে আরজিকরে গিয়েছিলাম। একটা মিটিং ছিল। করিডোরে অনুরাধার সঙ্গে দেখা হতে রাস্তার মধ্যে টিপ করে প্রণাম করে বসলো। বললো - জানি আপনি আসছেন। আমি ক্লাসটা নিয়ে আসছি। আপনার মিটিং দু-ঘণ্টা চলবে। আমি বললাম, তুমি চুল কেটে ফেলেছো কেন? বরাটের ভয়ে? অনুরাধা ডান হাত মুঠো করে বললো, বরাট আমার চেয়ে এক হাত লম্বা। না হলে ওর নাক ঘুসি মেরে ভেঙে দিতাম। আসলে কাজের বড্ড চাপ। বড় চুল থাকলে চুলের জন্য অনেক সময় দিতে হয়। তাই কেটে ফেলেছি। রিটায়ার করার পর আবার চুল রাখব। বরাট হাসতে হাসতে বললো - অনুরাধা আর শিপ্রা পাশাপাশি বসতো। দুজনেরই চুল খুব লম্বা। বেঞ্চে বসলে বিনুনি প্রায় মাটিতে লেগে যেত। ক্লাস শেষ হবার পর ওরা বেশ কিছুক্ষণ বেঞ্চে বসে গল্প করতো। একদিন ক্লাস শেষ হবার পর বের হবার সময় আমি নিচু হয়ে একটা বুলডগ ক্লিপ দিয়ে দুজনের বিনুনি একসঙ্গে আটকে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। তারপরের ঘটনা তো আপনি জানেন। প্রফেসর মুখার্জি বললেন - অনুরাধা অবশ্য তোমার খুব

প্রশংসা করছিলো। তুমি একটা কেস ওকে কিছুদিন আগে পাঠিয়েছিলে। তার কেস হিস্ট্রি, তোমার অবজারভেশন আর ডায়াগ্নোসিস ও স্ক্যান করে এল-সি-ডি দিয়ে ক্লাসে দেখিয়েছে। গত মাসে একটা কনফারেন্সে প্যারিস গিয়েছিলাম। সারা পৃথিবী থেকে চারশো ডাক্তার এসেছিল। প্লেনারি লেকচারটা দিলো তোমাদের সুজয়। তারপর আমি লন্ডনে আর একটা কনফারেন্সে যাব শুনে আমাকে হোটেলে থাকতে দিলো না। বাড়ি ধরে নিয়ে গেল। গিয়ে দেখলাম শ্যামল আর নিরুপমা এসেছে।

বরাট বললো - স্যার এখানে আমাকে নামিয়ে দিন। গলির মধ্যে ঢুকলে গাড়ি ঘোরাতে অসুবিধা হবে। প্রফেসর মুখার্জি বললেন - তুমি চিন্তা কোরো না। আমি বলে এসেছি রাত্তিরে দরকার হলে আমাকে যেন মোবাইলে ফোন করে। দরকার হবে বলে মনে হয় না। তবে এটা বলাতে ওরা সজাগ থাকবে।

*　　*　　*　　*　　*　　*　　*

টমেটো সুপটা দারুণ হয়েছে। আমি মাঝে মাঝে ক্যালকাটা ক্লাবে লাঞ্চ করি। তাদের সুপটা এরকম হয় না। তোমার রেসিপিটা দিও। কলকাতায় গিয়ে চেষ্টা করে দেখবো - প্রফেসর মুখার্জি বললেন। অর্পিতা বললো - এর মধ্যে বিশেষ কিছু নেই। তবে আমি টমেটো থেকে সুপটা করেছি। হোটেলে হয়তো সুপ পাউডার ব্যবহার করে থাকে। আসুন, ডিনার দেওয়া হয়ে গেছে। প্রফেসর মুখার্জি বললেন - ভালো গন্ধ বার হচ্ছে। মনে হচ্ছে ডিনারটা জব্বর হবে। অর্পিতা সুজয়ের দিকে মুচকি হাসি হেসে বললো - আপনার ছাত্র আমাকে বলেছে আপনি কি খেতে ভালোবাসেন। রান্না সেইমতো হয়েছে।

প্রফেসর মুখার্জি বললেন - অনেকদিন পর আজ সারাটা দিন বেশ কাটলো। আড্ডাটা বেশ জমেছিলো। এইসময় বরাট থাকলে বেশ ভালো হতো। সুজয় বললো - আমি অনেকবার বরাটকে বলেছি এদেশে বেড়িয়ে যাওয়ার জন্য। বাবু বললেন - আমি তোর মতো বড়লোক নই। আমি বললাম - তুই আর পর্ণা পাসপোর্টটা কর। আমি দুটো কলকাতা-লন্ডন রিটার্ন টিকিট আর ভিসার জন্য যা কাগজপত্র লাগে পাঠিয়ে দেবো। তোর খরচ শুধু ট্যাক্সি করে বাড়ি থেকে দমদম যাওয়ার। অর্পিতা লন্ডনের ম্যাপটা মাথার মধ্যে রেখেছে। লন্ডনের অলি-গলি সব চেনে। তোদের সব দেখিয়ে দেবে। তারপর আমরা স্কটল্যান্ড বেড়িয়ে আসবো। প্রফেসর মুখার্জি বললেন - বরাট কি বললো? সুজয় বললো - যা বললো তা বরাটের পক্ষেই সম্ভব। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কলকাতাকে লন্ডন বানিয়ে দেবেন। তাহলে আর পয়সা খরচ করে লন্ডন যাওয়া কেন? কলকাতায় বসে লন্ডন দেখা যাবে। লন্ডন-আই-এর মতো ক্যালকাটা-আই নাকি কোথাও একটা বসবে।

তুই এখনো গান করিস - শ্যামল সুজয়কে বললো। সুজয় ছুরি দিয়ে ফিশফ্রাইটা কেটে ফর্ক দিয়ে গেঁথে মুখে তুলতে গিয়ে নামিয়ে রাখলো। চেয়ারটাকে একটু পিছনে ঠেলে জায়গা করে উঠে দাঁড়ালো। বড় হলঘরটা একদিকে খাবার ব্যবস্থা, উল্টোদিকে বসবার জায়গা। মাঝখানে অনেকটা জায়গা ফাঁকা। তার উপর দামি, মোটা লাল কার্পেট পাতা। সুজয় হাত-পা নেড়ে নাচবার ভঙ্গি করে গান ধরলো - ওগো নিরুপমা, করিও ক্ষমা / তোমাকে আমার ঘরণী করিতে / আমার মনের দোসর করিতে / পারিলাম না, পারিলাম না কিছুতেই। নিরুপমার মুখ লাল হয়ে উঠলো। সকলে হাসতে সুরু করলো। শ্যামল বললো - সুজয় তুই নিরুকে ঘরণী করতে পারিসনি তো কি হয়েছে? একদিন বিকেলে নিরুর হাত ধরে হাইড পার্কে ঘুরে আয় না। নিরুপমা চোখ পাকিয়ে শ্যামলকে বললো - তুমি চুপ করো। স্যারের সামনে আজেবাজে কথা বলতে লজ্জা করছে না? শ্যামল বললো - তা যাই বলো সুজয়ের গানের গলা খুব মিষ্টি। ডাক্তার না হয়ে গান করলেও ইকোয়ালি নাম করতো। সুজয় বললো - না তা হতো না। আমি স্বরলিপি পড়তে জানি না। সত্যি কথা বলতে কি আমি সারেগামাও জানিনা। আমি শুনে শুনে গান তুলি। তবে তিন চার বার মন দিয়ে শুনলে গানটা তুলে ফেলতে পারি। শ্যামল বললো - খাওয়ার পর একটা গানের আসর বসতে পারে। সুজয় বললো - অবশ্যই। অর্পিতা যদি গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজায় তাহলে আরও ভালো হয়। প্রফেসর মুখার্জি বললেন - আচ্ছা নিরুপমা, তুমি এখন স্কুলের ছাত্রী নও, তুমি এন-আর-এসের একটা ডিপারমেন্টের হেড। শ্যামল আর সুজয় তোমার লেগ পুল করছে বুঝতে পারছো না? নিরুপমা সে কথায় কান না দিয়ে অর্পিতাকে বললো - এই বাঁদরটার সঙ্গে ঘর করিস কি করে? অর্পিতা বললো - নিরুদি, আমার শ্বশুর মশাই নিপাট ভদ্রলোক কলেজ মাস্টার ছিলেন। তাই এনাকে রামগরুড়ের ছানা বললে তাঁকে অসম্মান করা হবে। সারাদিনে এনার সঙ্গে আমার আধঘণ্টা কথা হয় কিনা সন্দেহ। হাসপাতাল, রুগী, লেখাপড়া, ইন্টারনেট দেখা, পেপার লেখা এ সব করতে করতে এনার সারাদিন চলে যায়। এনার এই ফর্ম বের হয় কলেজের বন্ধুরা আসলে। কালকেই পাশের বাড়ির রেবেকা জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের বাড়িতে কলকাতা থেকে কারা এসেছেন? ডক্টর বোসের গলা পেলাম মনে হলো।

প্রফেসর মুখার্জি বললেন - নিরুপমা, এইসব ছেলেদের বাঁদর হনুমান একদম বলো না। বিশেষত বরাট থাকলে। নিবেদিতার কি হয়েছিল মনে নেই? শ্যামল বললো - বরাটের অনেক কীর্তি-কাহিনী শুনেছি। কিন্তু এটা জানিনা। শ্যামলদা আপনি নিবেদিতাকে চেনেন - সুজয় জানতে চাইলো। নিরুপমা ফোঁস করে উঠলো - চেনে না মানে? ইন্টার্ন থাকার সময় ফার্স্ট ইয়ার ক্লাসের পাশে ঘুরঘুর করতো না। সুজয় ফোড়ন কাটলো - না হলে আর তোকে তুললো কি করে? শ্যামল বললো - বরাটের এই গল্পটা শোনা যাক। সুজয় বললো - আমি যতটা জানি বলছি। ক্যান্টিনের বড় টেবিলটায় বসে আড্ডা চলছে। হঠাৎ বরাট আর নিবেদিতার মধ্যে তর্ক বেধে গেল। বিষয়টা কি এতদিন পরে মনে নেই। যাইহোক কিছুক্ষণ পর বরাটের যুক্তির কাছে নিবেদিতা দাঁড়াতে পারলো না। তর্কে হেরে গিয়ে নিবেদিতা বরাটকে বললো - তুই একটা

হনুমান। এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলছিলো। বরাট চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো - হনুমান না? হনুমান যা করেছিলো আমি তাই করবো। বরং তার চেয়ে কিছুটা বেশি করবো। কলেজে অনেক গাছ আছে অশোকবনের মতো। আমি নিবেদিতাকে পিঠে নিয়ে ঐ সামনের আম গাছটায় আগে উঠবো। ওখান থেকে লঙ্কাকাণ্ড শুরু হবে। বলে নিবেদিতার দিকে এগোতে লাগলো। নিবেদিতা বাবাগো বলে এক ছুটে দরজা দিয়ে বের হয়ে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেবে প্রিন্সিপালের ঘরে ঢুকে পড়লো। প্রফেসর মুখার্জি বললেন - এর পরেরটা আমার কাছ থেকে শোনো। আমি প্রিন্সিপালের সঙ্গে বসে ক্লাস রুটিন নিয়ে আলোচনা করছিলাম, এমন সময় বরাট স্যার, বরাট স্যার বলতে বলতে নিবেদিতা প্রিন্সিপালের চেয়ারের পিছনে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়ালো। প্রিন্সিপাল চমকে উঠে এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন। আমি বুঝলাম বরাট নিশ্চয়ই একটা কাণ্ড বাঁধিয়েছে। ঘরের বাইরে এসে দেখি একটু দূরে বরাট দাঁড়িয়ে আছে। ইতিমধ্যে নিবেদিতা পায়ে পায়ে আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। বরাট বললো - নিবেদিতা আমাকে হনুমান বলেছে। নিবেদিতা বললো - আমাকে স্যার কাঁধে নিয়ে ঐ আম গাছটায় চড়ে লঙ্কাকাণ্ড করবে বলছে। প্রিন্সিপাল বললেন - বরাট কাছে এসো। দেখি তোমার মুখটা পোড়া কিনা। নিবেদিতা ফট করে বললো - লঙ্কাকাণ্ড করার পর রাবণের চেলারা হনুমানের লেজে আগুন দিয়েছিলো। হনুমান সে আগুন নেভাতে লেজটা মুখের মধ্যে ঢোকাতেই মুখ পুড়ে যায়। প্রিন্সিপাল বললেন - ঠিক কথা। অশোকবন ধ্বংস করার আগে হনুমানের মুখ পোড়া ছিল না। বরাট তুমি ঘুরে দাঁড়াও তো। না। তোমার তো লেজ নেই। লেজ ছাড়া হনুমান হয় নাকি? নিবেদিতা তোমার মামলা ডিসমিস। শোনো বরাট, এই শীতকালে তোমার ভয়ে এই মেয়েটা ঘামতে শুরু করে দিয়েছে। যাও ওকে ক্যান্টিনে গিয়ে এক কাপ গরম কফি আর পকোড়া খাইয়ে চাঙ্গা করো। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন - এইসব খাতা লেখার কাজ করতে করতে জীবনটা একঘেয়ে হয়ে যায়। বরাটের মতন কয়েকজনের জন্য মনে হয় কলেজের একটা প্রাণ আছে।

প্রফেসর মুখার্জি গম্ভীর মুখ করে কি যেন ভাবলেন। সুজয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন - একটা সত্যি কথা বলবে? প্রফেসর মল্লিকের ক্লাসে কে ছাগল ঢুকিয়েছিল? সুজয় লজ্জায় মাথা নিচু করলো। শ্যামল বললো - নানা জায়গা থেকে নানা ভার্সন শুনেছি, কিন্তু ঠিক ঠাক ছবিটা এই সুজয় কিম্বা বরাটের কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে। প্রফেসর মল্লিক উপরে চলে গেছেন। সুজয় তুই আমাদের গল্পটা বলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। সুজয় হাসতে গিয়েও গম্ভীর হয়ে গেল। সুজয় সুরু করলো - প্রফেসর মল্লিক খুব খারাপ পড়াতেন। ফিস ফিস করে কি বলতেন শোনা যেতো না। বোর্ডে এক গাদা ছোট ছোট করে কি সব লিখতেন, আর লিখেই মুছে দিতেন। প্রফেসর মুখার্জি সুজয়কে থামিয়ে দিয়ে বললেন - আমিও প্রফেসর মল্লিকের ছাত্র। এসব জানা আছে। আসল গল্পটা বলো। এবার সুজয় হেসে ফললো - একদিন ক্লাসের পর আমি আর বরাট গল্প করছি। অতসী আমাদের পাশে এসে বসলো। তোরা সবসময় আমাদের পিছনে লাগিস, মল্লিককে সাইজ করতে পারিস না। পরের দিন বরাট মাস্টার প্ল্যানটা নিয়ে এলো, আমি একটু

ফাইন টিউন করলাম। আমাদের লেকচার থিয়েটারে পুব দিকের দরজা দিয়ে ঢুকতাম। পশ্চিম দিকে আর একটা দরজা ছিল সেটা ভিতর থেকে বন্ধ থাকতো। এই দরজার বাইরে একটা গলি তার পর দেওয়াল। গলির শেষ প্রান্তে দারোয়ানদের ঘর। গলির মধ্যে দারোয়ানদের পোষা ছাগলগুলো ঘুরে বেড়াতো। চারজন উপর ভার পড়লো গলির অন্য প্রান্ত ব্লক করে দাঁড়িয়ে থাকার। ছোটখাটো চেহারার কমলেশ আর বাসব একটা ছাগলছানাকে তাড়িয়ে দরজার বাইরে নিয়ে এলো। ভেতর থেকে দরজার ছিটকিনি খোলা ছিল। প্রফেসর মল্লিক বোর্ডে লেখার জন্য ঘুরে দাঁড়াতে আমি গ্যালারি থেকে জানলা দিয়ে সিগনাল দিলাম। কমলেশ ছাগলটা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো। ছাগলটা ফাস্ট বেঞ্চের সামনে প্রথমে চুপ করে দাঁড়ালো। অতসী বাঁ-পা দিয়ে ছাগলটার পিছনে লাথি লাগাতে ছাগলটা বিকট চিৎকার করে কয়েকবার ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করলো। তারপর সম্ভবত অত লোক দেখে ঘাবড়ে গিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগলো। প্রফেসর মল্লিক চক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

*　　*　　*　　*　　*　　*　　*

লালুদা বললেন - বরাট তুমি নাকি প্রফেসর সিংহকে চেম্বার থেকে বার করে দিয়েছো? বরাট বললো - সেটাও আপনার কানে গেছে? ঠিক বার করে দেই নি। তবে অনেকটা সেই রকম।
- কি হয়েছিলো?
- মাসখানেক আগে একদিন রাতে প্রায় চেম্বার বন্ধ করার সময় প্রফেসর সিংহ তার বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে এলেন। প্রফেসর সিংহকে আমি চিনতাম না। মেয়েকে দেখে আমার ভালো লাগলো না। বললাম, কাল সকালে আটটার সময় আসুন। দিনের আলোতে একটু সময় নিয়ে দেখবো। ভদ্রলোক বললেন, আপনার চেম্বার তো সকাল নটার সময় খোলে। আটটার সময় এসে কি করবো। মেজাজ গরম হয়ে গেল। মেজাজ সামলে বললাম, আমি যখন আসতে বলেছি তখন দরজা নিশ্চয়ই খোলা থাকবে। পরের দিন ভদ্রলোক মেয়েকে নিয়ে এলেন। মেয়েকে যা প্রশ্ন করি ভদ্রলোক তার উত্তর দিয়ে দেন। আমি বললাম, আপনি দূরে গিয়ে বসুন। উত্তরটা আপনার মেয়ের কাছ থেকে শুনতে চাই। ভদ্রলোক গজ গজ করতে করতে চেম্বারের বাইরে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালেন। দেখা হয়ে গেলে ভদ্রলোককে ডেকে বললাম - মেয়েটির রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। সেই সঙ্গে আপনার আর আপনার স্ত্রী রক্ত পরীক্ষা করলে ভালো হয়। মেডিক্যাল কলেজে হেমাটোলজি ডিপার্টমেন্টে ডক্টর সোমকে একটা চিঠি লেখে দিচ্ছি। ভদ্রলোক বললেন, শরীর খারাপ আমার বাচ্চার। আমার আর আমার স্ত্রী রক্ত পরীক্ষা করবো কেন? আবার আমার মেজাজ গরম হয়ে গেল। তাও মাথা ঠাণ্ডা রেখে বললাম, মেয়ে আপনাদের বলে। ভদ্রলোক কি বুঝলেন জানিনা। ফি দিতে গেলেন। আমি বললাম, ছ-বছরের কম বয়সের বাচ্চাদের থেকে আমি ফি নেই না।
- তাই নাকি? কিন্তু কেন - লালুদা জানতে চাইলেন।

- ঠিক কারণ কোনো নেই। তবে বাচ্চাদের দেখলে আমার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। তখন আমি জামালপুরে। মাসে তিন দিন নাইট ডিউটি করতে হতো। আমি সাধারণত সকালে গিয়ে নাইট ডিউটি করে পরের দিন ফিরতাম। পরের দিনটা অফ পেতাম। রাতে ঘরে বসে বই পড়তাম আর আধ ঘণ্টা অন্তর একটা রাউন্ড দিয়ে আসতাম। বিকেল থেকে একটা ছ-মাসের বাচ্চার অবস্থা ভালো নয়। মেনিঞ্জাইটিস হয়েছে। একজন নার্সকে বলেছি বাচ্চাটার পাশে বসে থাকতে। বাচ্চাটার মাও সঙ্গে আছে। রাত একটা নাগাদ ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি সেই নার্স ওয়ার্ডের আর এক মাথা থেকে হাত তুলে ডাকছে। তাড়াতাড়ি বাচ্চাটার কাছে গেলাম। আমার সামনে বাচ্চাটার হার্ট বন্ধ হয়ে গেল। এর আগে বড়দের হার্ট ম্যাসাজ করেছি। মুখে মুখ লাগিয়ে আর্টিফিশিয়াল রেসপিরেশন দিয়েছি। কিন্তু বাচ্চাদের কখনও করিনি। বড়দের হার্টে চাপ দিয়ে হার্ট চালু করতে হয়। বাচ্চাদের চাপ দেওয়া যায় না। টোকা দিতে হয়। যাইহোক বই পড়া বিদ্যে দিয়ে হার্ট চালু করার চেষ্টা সুরু করলাম। দু-বার হার্ট স্টার্ট নিলো, তারপর বন্ধ হয়ে গেল। প্রায় তিরিশ সেকেন্ড চেষ্টার পর হার্ট চলতে সুরু করলো। সপ্তাহ তিনেক পর বাচ্চাটা ভালো হয়ে বাড়ি চলে গেল। এর প্রায় বছর তিনেক পরের কথা। লাঞ্চের সময় সাইকেল করে বাড়ি যাচ্ছি। বড় রাস্তা থেকে শর্টকাত করতে একটা গলির মধ্যে ঢুকেছি। উল্টোদিক থেকে একটা সাইকেল রিক্সা রাস্তা আটকে এমন ভাবে দাঁড়ালো যে আমার যাওয়ার আর পথ নেই। বিরক্ত হয়ে সাইকেল থেকে নেবে পড়লাম। রিক্সা থেকে এক মহিলা নামলেন, হিন্দিতে বললেন, ডক্টর-সাব আপনার হয়তো মনে নেই। এই বাচ্চাটার হার্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। আপনি ধাক্কা দিয়ে চালু করেছিলেন। এবার আমি রিক্সার সিটের দিকে তাকালাম। বছর তিনেকের একটা বাচ্চা বড় বড় চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হলো প্রফেসর মুখার্জি একদিন ক্লাসে বলেছিলেন, আমরা ডাক্তাররা প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারিনা, মৃত্যুকে বিলম্বিত করাতে পারি মাত্র। সেদিন আমার মনে হলো এটা কি ঠিক? বাচ্চাটার হার্ট তো বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

এর প্রায় তিন বছর পর আমি রেলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় ফিরে আসা ঠিক করি। স্টেশনে বিদায় দিতে প্রায় ৫০ জন এসেছিল। ট্রেন ছাড়ার একটু আগে এই বাচ্চাটা তার মার সঙ্গে এলো। মহিলা বললেন, আজ এর জন্মদিন। বাচ্চাটা ছটা লাল গোলাপের একটা তোড়া আমাকে দিল। ছটা গোলাপ তার এই পৃথিবীতে ছ-বছর থাকার প্রতীক। আজও সেই বাচ্চাটাকে ভুলতে পারিনি। যদিও সে এখন আর বাচ্চা নেই। জামালপুরে আর কোনোদিন যাওয়া হয় নি। কিন্তু কেন জানিনা ছ-বছরের কম বাচ্চাদের কাছ থেকে আমি ফি নিতে পারিনা।

- যা বলছিলে। প্রফেসর সিংহের মেয়ের কথা।
- হ্যাঁ, দিন সাতেক পর প্রফেসর সিংহ আবার এলেন মেয়েকে নিয়ে। শরীর আরো খারাপ হয়েছে। আমি বললাম, ব্লাড রিপোর্ট এনেছেন? সিংহ মশাই বললেন, গিয়ে উঠতে পারি নি।

একটা সেমিনার নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। আমি বললাম, আপনি আসতে পারেন। আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। দিন চারেক পর একজন ভদ্রমহিলা এলেন। পরিচয় দিলেন, মিসেস সিংহ। বললেন, আমি আমার মেয়ের আর আমার রক্ত পরীক্ষা করে এনেছি আপনার কথা মতো। এই তার রিপোর্ট। আমার স্বামীকে নিয়ে যেতে পারিনি। ওঁর ব্যবহারের জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। আমি বললাম, সোম কি কিছু বলেছে? উনি বললেন, ডক্টর সোম আপনার সঙ্গে আগে কথা বলতে বলেছেন। আমি বললাম, আপনার মেয়ে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত। তাকে নিয়মিত রক্ত দিয়ে যেতে হবে। বাচ্চাটা অ্যাডাল্ট হিমোগ্লোবিন তৈরি করতে পারে না। এটা একটা জিন-ঘটিত রোগ বলতে পারেন। মিসেস সিংহ বললেন, কেন এমন হলো। আমি বললাম, আপনি ও আপনার স্বামী দুজনেই থ্যালাসেমিয়ার ক্যারিয়ার। আপনারা স্বাভাবিক হলেও আপনাদের বাচ্চার থ্যালাসেমিয়া মেজর হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা পঁচিশ ভাগ। শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সম্ভাবনা থ্যালাসেমিয়া ক্যারিয়ার হওয়ার আর শতকরা পঁচিশ ভাগ সম্ভাবনা একদম স্বাভাবিক হওয়ার। আপনাদের দুর্ভাগ্য যে এই বাচ্চাটা থ্যালাসিমিয়া মেজর নিয়ে জন্মেছে। আপনারা ডক্টর সোমের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। উনি এ ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ। ওঁর পরামর্শ মতো চলবেন।

- তাহলে তুমি বলছো বাবা এবং মা দুজনেই ক্যারিয়ার না হলে বাচ্চা কখনও থ্যালাসেমিয়া নিয়ে জন্মাবে না।

- ঠিক তাই। মা এবং বাবা দুজনের মধ্যে একজন যদি স্বাভাবিক হয় তাহলে বাচ্চাটা হয় স্বাভাবিক অথবা থ্যালাসেমিয়া ক্যারিয়ার হয়ে জন্মাবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া মেজর হওয়ার সম্ভাবনা একদম নেই। যদি থ্যালাসেমিয়া ক্যারিয়ারদের মধ্যে বিয়ে না হয় অর্থাৎ বিয়ের আগে যদি এই পরীক্ষা করা হয় তাহলে দেশ থেকে থ্যালাসেমিয়া নির্মূল করা সম্ভব।

লালুদা বললেন - তুমি তো ভালো হিন্দি জানো। এটা পড়ে দাও তো। বরাট কাগজটা নিয়ে বললো - ছাপা লেখা পড়তে পারি। এতো বিচ্ছিরি জড়ানো হাতের লেখা পড়া সম্ভব নয়। লালুদা বললেন - ডাক্তাররা তো খারাপ হাতের লেখার জন্য বিখ্যাত। বরাট বললো - সেটা আমার বেলায় খাটে না। হাতের লেখার জন্য বরাবর আমি পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়েছি। আর ডাক্তারদের লেখা তো ওষুধের দোকান পড়ে। আর একজন ডাক্তারকে বড় একটা পড়তে হয় না। লালুদা বললেন, সেই ডাক্তারের বউকে চিরকুট পাঠাবার গল্পটা জানো তো? সাড়ে ছটার সময় নিউ মার্কেটের সামনে এসো লিখে পাঠিয়েছে। যথারীতি ম্যাডাম সেটা পড়তে পারেন নি। পাশের ওষুধের দোকানের দেখালে নিশ্চয়ই পড়ে দেবে এই ভেবে চিরকুটটা দেখাতে তারা দুটো খাম দিয়ে বললো, সকালে একটা, বিকালে একটা, পাঁচ দিন খাবেন। আমি একটা কথা ভাবছিলাম। কাগজে দেখলাম মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া এম-বি-বি-এসের জন্য নতুন সিলেবাস করার ভাবনা চিন্তা করতে সুরু করেছে। এ ছাড়া সারা ভারতে একটাই জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষার কথা ভাবা হচ্ছে। ভাবছি এমসিআইকে লেখবো যে জয়েন্ট পরীক্ষায় মাতৃভাষা আর ইংরাজিতে একটা ডিক্টেশন নেবার পরীক্ষা রাখার কথা বিবেচনা করতে। সেই

পরীক্ষায় হাতের লেখা আর বানান দেখা হবে। একশোর মধ্যে পঁয়ষট্টির কম পেলে তাঁদের আর ডাক্তারি পড়তে দেওয়া হবে না। বরাট বললো - ভালো প্রস্তাব। শুনেছি এখন থেকে নাকি ডাক্তারদের পাঁচ বছর অন্তর রিফ্রেসার্স কোর্স করতে হবে। না হলে রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়ে যাবে। সেখানে হাতের লেখার পরীক্ষা থাকলে অনেক নামি দামি ডাক্তারের রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়ে যেতে পারে। আমার মনে হয় ২০১৬ থেকে আপনার প্রস্তাব কার্যকরী করলে ভালো হয়। অর্থাৎ যে সব স্কুল পড়ুয়ারা ডাক্তার হবার স্বপ্ন দেখছে তারা এখন কয়েক বছর সময় পাবে হাতের লেখা ভালো করার। আজ তাহলে উঠি।

March-April 2012